বাগদাদ থেকে কুর্দিস্থান

বাগদাদ শহর

বাগদাদ থেকে কুর্দিস্থানের ইরবিলের দুরত্ব প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। মসুল শহর হয়ে কুর্দিস্থানের ইরবিল প্রদেশে যেতে হয় । ইরবিল ছাড়াও ইরাকের মসুল শহর থেকে ডহুক প্রদেশে যাওয়া যায়। সোলেমানিয়া যেতে হলে কিরকুক থেকে অন্য পথে আন্তর্জাতিক অবরোধ আরোপের আগে যাওয়া যেত। ১৯৯৬-৯৭ সালে এ পথদিয়ে যাওয়ার জন্য ইরাক সরকারের অনুমতি না থাকায় ইরবিল হয়ে সোলেমানিয়া প্রদেশে যেতে হতো। কুর্দিস্থানের এই তিনটা প্রদেশে কোন বিদেশী আসতে হলে ইরাক সরকারের থেকে আলাদা অনুমতিপত্র নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক তা না হলে চেক পয়েন্ট গুলো থেকে গ্রেফতার বা ফিরে আসতে হবে। জাতিসংঘে কর্মরত সদস্যবৃন্দ সবাই এই অনুমতি পত্র নিয়ে স্থল পথে গাড়ীতে কুর্দিস্থানে যেত সেখানে জাতিসংঘ পরিচালিত বিভিন্ন মানবিক কর্মকান্ডে সহযোগিতা করতে। বাগদাদ এক বিশাল শহর। সাজানো রাস্তা ঘাট তবে ম্লান ভাব বুঝাতো যে প্রাণনেই শহরে। বহু বছর এ শহরে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষন হয়নি।

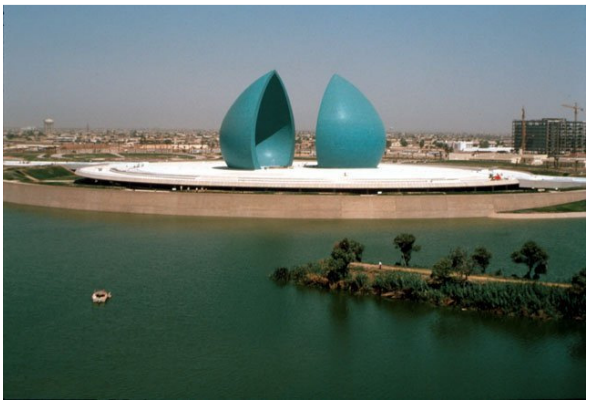

অজানা শহীদদের স্মরণে বানানো নয়নাভিরাম মনুমেন্ট

বাগদাদের বিশাল বিশাল মনুমেন্ট ও সাজানো শহরের দৃশ্য, স্বাধীনতার ভাস্কর্য, ফোরাত নদীর উপর দিয়ে বানানো ব্রিজ, অজানা শহীদদের স্মরণে বানানো বিশাল এলাকা দুরে বিস্তৃত নয়নাভিরাম মনুমেন্ট দেখতে দেখতে কখন যে শহর ছেড়ে যেতাম বুঝতে পারতাম না। চেক পয়েন্ট এলে বুঝতাম এবার কাগজ পত্র দেখাতে হবে। শহর থেকে

বের হওয়ার সময় অনুমতি পত্র দেখিয়ে ইরবিলের রাস্তায় যাত্রা করতাম। প্রশস্ত রাস্তা, দুপাশে মাঝে মাঝেই খেজুর বাগান, সবল দীর্ঘ গাছ গুলোতে কাঁচা খেজুর ধরে আছে। মাঝে মাঝে কেয়ারটেকার ও দুই চারজন লোক দেখা যেত। রাস্তা দিয়ে আন্ত প্রাদেশিক বাস কিছু যাত্রী নিয়ে চলাচল করত। তাদের সাথে অবশ্যই অনুমতি পত্র থাকত। মাঝে মাঝে পিকআপ ভ্যান নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্য নিয়ে চলাচল করত। তেলবাহী বিশাল লরী গুলো মধ্যম গতিতে আস্তে আস্তে প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলোতে তেল সরবরাহ করত। রাস্তা গুলো সব ওয়ানওয়ে মাঝে মাঝে টার্ণিং এর জন্য কিছু জায়গা আছে সেখানে পুলিশ কার কখনো কখনো দাড়িয়ে থাকে। বাগদাদ থেকে কিছুক্ষন ড্রাইভ করলে সালাউদ্দিন গভরনরেটের রাস্তা ডান দিকে চলে গেছে মূল সড়ক থেকে, দুরে দেখা যেত শহরের ভবন গুলো । দুর থেকেই ডানে টার্ণিং এর বোর্ড দেখা যায় আরবী ও ইংরেজীতে, দুরত্বও দেয়া আছে এ সব মার্কিংএ । দিগন্ত ভেদ করে আশে পাশের শহরের মসজিদের মিম্বার গুলো দেখা যেত ,বহুতল ভবন তেমন দেখা যেত না । সামারা শহরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সোনালী গম্বুজ মসজিদ দেখতাম। দুর থেকে সোনালী আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। এগুলোর প্রত্যেকটিরই একটু ইতিহাস আছে। যেতে ইচ্ছে করত সে সব জায়গাতে তবে এসব মুভে নির্দিষ্ট রাস্তা ছেড়ে অন্যরাস্তা বা শহরে ঢোকার অনুমতি নেই। বহুবার একই পথে আসা যাওয়ার সময় কখনো ডানে কখনো বামে শহর গুলো দেখতে দেখতে যেতাম। মানুষ খুব একটা চোখে পড়ত না। মাঝপথে গাড়ীতে পেট্রোল নিতে হতো। রাস্তা থেকে ভেতরের দিকে পাম্প হাউজ গুলো। তেল এখানে সহজলভ্য। গোটা ট্যাংক ভরে নিলে ৪৫ দিনার লাগে। এত ছোট দিনারের নোট এখন নেই তাই আমরা ২৫০ দিনার এর একটা নোট দিয়ে দিতাম। এক ডলারে প্রায় ২০০০ দিনার পাওয়া যেত তখন। এক সময় এক দিনার ছিল ৩.৩ ডলার। হায়রে ইরাক ! পেট্রোল পাম্প গুলো বিশাল এলাকা নিয়ে, চারপাশ খোলা। অফুরন্ত তেলের ভান্ডার। ইরাকী মালিক অনুপস্থিত এই দুর্দিনে। একজন আফ্রিকান কিংবা কালো আরব দায়িত্বে থাকত। প্রায় সবগুলোতেই ইরাকী দেখা যেত না। দরিদ্র আফ্রিকানরা তেল বিক্রির জন্য সেখানে চাকুরীরত ছিল। মানুষ গুলোর মুখে হাসি নেই, যদিও সে ৪৫ দিনার এর বদলে ২৫০ দিনার পেয়েছে তবুও সে জানত যে এই দিনার দিয়ে একটা খবুজ বা রুটিও পাবে না। বিরস বদনে সে টাকাটা নিয়ে ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে হাত নেড়ে প্রতুত্তর দিত। ২/১ বোতল পানি বা বিস্কিটের প্যাকেট দিলে খুশী হয়ে যেত তার এক দিনের লাঞ্চ কিংবা ডিনার হয়ত সেটা হবে। পাম্প গুলোতে পানি তেমন পাওয়া যেত না তবে ফ্রেস হবার জন্য প্রায় সবাই রেষ্ট রুমে ঘুরে আসত। দীর্ঘ ৫/৬ ঘন্টার ভ্রমণ নিতান্তই কম না। সমতল রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মসুল শহরের উপকণ্ঠে চলে আসতাম। মসুল ইরাকের একটা সুন্দর শহর। শহরের রাস্তা ঘাট প্রচুর। নানা রকম বাঁক মোড় পেরিয়ে আমাদের চলতে হতো। ছবির মতই শহর তবে দেখেই বুঝা যায় যুদ্ধবিধ্বস্থ। বেশীর ভাগ বাসাই ডুপ্লেক্স, মাঝে মাঝে ৩/৪ তলা বাড়ী দেখা যায়। কিছু বড় বড় মার্কেট আছে, তবে নিষ্প্রান। মানুষের চলাচল স্বাভাবিক, শহরের জনসংখ্যাও একটু বেশী মনে হয়। মসুল শহরে এলেই দুর থেকে হযরত ইউনুস (আঃ) এর মাজার চোখে পড়ে। পাহাড়ের চুড়ার কাছে তাঁর মাজার। স্থানীয় লোকেরা বলে নবীয়ে ইউনুস (সঃ) । এখানে তাঁর মাজার ও তৎসংলগ্ন মসজিদ আছে। মসজিদ ও মাজার যেয়ারত এর কথা আগে অন্য জায়গাতে বলেছি। মসুল শহর থেকে বের হলে কিছুক্ষণ পরেই গভারর্নমেন্ট অব ইরাক এর শেষ চেকপোষ্ট । সব গাড়ী এখানে থামে। পুলিশ ও ইমিগ্রেশন পোষ্টে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র জমা দিতে হয়। তার

পর কুর্দিস্থানে ঢোকার অনুমতি মেলে। সবকিছু মোটামুটি দেখে নেয় কর্তব্যরত পুলিশ কর্তৃপক্ষ। এরপর নো ম্যান্স ল্যান্ড শেষ হলেই পিডিকে সমর্থিত কুর্দি চেকপোষ্ট। এখানে বলে রাখা ভাল ইরবিল ও ডহুক প্রদেশ পিডিকের নিয়ন্ত্রনে সোলেমানিয়ায় পি ইউ কে এবং ইসলামিক মুভমেন্টের নিয়ন্ত্রনে। ইরবিল কুর্দিস্থানের রাজধানী।

কুর্দিস্থানের পথে

কুর্দিস্থানের পথে কিছুদুর এগিয়ে গেলে আস্তে আস্তে পাহাড় এর ছোয়া পাওয়া যায়। প্রশস্ত রাস্তা কখনো পাহাড় কেটে কখনো উচু ভূমির উপর দিয়ে চলছে ইরবিলের পথে। কুর্দিস্থান মূলত মালভূমি অঞ্চল, সমুদ্র সমতল থেকে বেশ উচুতে। এছাড়া ছোট বড় পাহাড় শ্রেণী রয়েছে এখানে। পাহাড় গুলো মূলত পাথরে, আমাদের দেশের মত পলিপূর্ণ না। বালুকাময়, ধুষর ও কঙ্কর যুক্ত। মাঝে মাঝে ঘাসে ছাওয়া এলাকা দেখা যায় তবে বেশীর ভাগ এলাকা হলুদাভ ধূষর। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দুরে বহু দুরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনবসতি চোখে পড়ে। একতলা ইটের বাড়ী সিমেন্ট ও কঙ্কর দিয়ে বানানো মাঝে মাঝে রান্নাবান্নার ধোয়া দেখা যায়, সহজ সরল জীবন। পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো। প্রশস্ত রাস্তা, ইরবিলের কাছাকাছি আস্তে আস্তে জনবসতি বাড়ছে। রাস্তা থেকে বেশ দুরত্ব রেখে পেট্রোল পাম্প, দোকান পাট তবে দোকানের সাইন বোর্ড গুলো বিবর্ণ ইংরেজী ও আরবীতে লিখা। কুর্দি ভাষা আরবী বর্ণমালা দিয়ে লিখা হতো এবং এখনো হয় তবে তুর্কীদের মত তারাও রোমান হরফে তা বদলানোর চিন্তাভাবনা করছে। ইরবিল ঢুকতেই কুর্দিস্থানের পার্লামেন্ট ভবন। সাদ্দাম হোসেনের সময় কুর্দিরা অটোনমি পেয়েছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে। পার্লামেন্ট ভবনের সামনে পতাকা উড়ছে কিন্তু পার্লামেন্ট এখন কার্যকর নয়। কারণ কুর্দিস্থান বর্তমানে ৩ ভাগে বিভক্ত এবং তিনটি দল তার প্রদেশ গুলো নিয়ন্ত্রন করছে। পথে রাশিয়ার তৈরী বিখ্যাত কালাসনিকভ হাতে পেশমারগাররা হেটে চলছে কুর্দিদের পোষাকে। পোষাকের বিশেষত্ব হলো এটা ঢিলেঢালা শার্টের মত এবং এর সাথে পাজামা এক সংগে সেলাই করা। মাথায় কেউ কেউ পাগড়ী বাধে মোটা কাপড়ের, এই পোষাকে সব কুর্দিরা বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। ইরাকের অন্যান্য অঞ্চলের মত কুর্দিস্থানেও যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দেখা যায়। বহু বছরের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সুন্দর রাস্তাগুলোতে এখন নানা জায়গায় গর্ত দেখা যায়। মাঝে মাঝে পানিও জমে। আইল্যান্ড গুলো অযত্নে পড়ে রয়েছে। এক সময় সুন্দর সবুজ গাছ ছিল এগুলোতে। দোকান পাটে মানুষ আস্তে আস্তে গরম লাল চা খাচ্ছে, অলস সময় কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে সামুন খায় এটা এক ধরনের তিন কোনাকার তন্দুর রুটি, কুর্দিস্থানে বেশ জনপ্রিয়। সেমাই

দিয়ে সুজির বরফীর মত একটা মিষ্টি বানায় এটাও বেশ বিখ্যাত কুর্দিস্থানে। মাঝে মাঝে দু তিনটা দামী গাড়ী দেখা যায় বেশীর ভাগই ভক্স ওয়াগন পাসাত টেক্সিক্যাব কিংবা প্রাইভেট কার। মর্সিডিজ, বি এম ডব্লিউ ইত্যাদি ভাল ব্রান্ডের গাড়ীর ও বেশ চলে এখানে। এগুলো যে অবরোধ পেরিয়ে কি ভাবে ঢোকে তা বুঝতে কারো বাকী নেই। সবকিছুতেই ফাঁক ফোকর, তাই দেদারসে চলছে চোরাকারবারীদের কাজকর্ম, দুরবস্থা শুধু নিরীহ সাধারণ মানুষের। একটু জীবিকার জন্য তারা শ্রমিকের কাজ করছে। দেশে চাকুরী নেই,ব্যবসায় মন্দা সব মিলিয়ে চরম দুরবস্থা চলতে চলতে মানুষের বিষাদ মাখা মুখ দেখে খারাপ লাগে। প্রাচুর্য' এক সময় এদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, এখন তা বহুদুরে। ইরবিল শহরের বাড়ী গুলো বেশ সুন্দর। পাথর ও সিমেন্টের ইট দিয়ে বানানো দোতলা বাড়ী সামনে পেছনে খোলা জায়গা। সৌখিন মানুষের বাড়ী গুলোর বাগান দেখার মত। দুঃখের দিনেও মানুষের সৌন্দর্যবোধ প্রশংসার দাবী রাখে। বাগদাদের প্রাচুর্য এখানে নেই সত্যি, তবুও কুর্দিরা তাদের জীবন চালিয়ে নিচ্ছে। সাদ্দামের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে তারা নেই এটাতে তারা খুশী হলেও তারা নিজেদের মধ্যেও শান্তিতে নেই। ইরাকে কুর্দিদের সম্বন্ধে একটা কৌতুক আছে, বলা হয় যে কুর্দিরা কখনো স্বাধীন হতে পারবে না। তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হলে কয়েক দিন ভাল থাকবে তারপর নিজেদের ভেতর যুদ্ধ করে আবার ভাগ হয়ে যাবে। কতটুকু সত্যি এই কথা তা বোঝা যায়নি তবে এটা ঠিক ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকা স্বাধীনচেতা কুর্দিদের জন্য বেশ কষ্টকর।

বাগদাদ থেকে ইরবিল চলে এলাম। ইরবিল থেকে অন্যান্য প্রদেশে যাওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। সোলেমানিয়াতে যেতে হলে ইরবিলের উপর দিয়েই যেতে হয়। জাতিসংঘের মানবিক সাহায্য দানের জন্য ইরবিলে সদর দপ্তর স্থাপন করাতে বহু বিদেশী এনজিও নিজস্ব এজেন্ডা নিয়ে কুর্দিস্থানে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে জুজু বুড়ির ভয়ের মত ইরাকী বাহিনীর আক্রমনে তারা তুরস্কের দিকে পালিয়ে যায়। পালানোর পথ তারা সব সময় খোলা রাখে। ভয়ভীতি বিপদ এর মাঝেও তাদের মানবিক ও অন্যান্য কার্যক্রম চলে।